

সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই ১৫ হাজার মাদ্রাসায়

আজিজুল পারভেজ >

নবম-দশম শ্রেণির কোনো শিক্ষার্থী এসএসসি পাস না করে পরবর্তী কোনো শ্রেণিতে ভর্তি হওয়া সম্ভব নয়। দেশে প্রচলিত অন্য কোনো শিক্ষাব্যবস্থায় সম্ভব না হলেও কওমি শিক্ষাব্যবস্থায় এটা কোনো ব্যাপার না। কাফিয়ায় (নবম-দশম শ্রেণি সমমর্যাদার) অধ্যয়নরত কোনো শিক্ষার্থী প্রতিষ্ঠান বদল করে অন্য প্রতিষ্ঠানে গিয়ে তাকমি জামাত (কামিল/মাস্টার্স) শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে যেতে পারে। এভাবেই চলছে দেশের কওমি মাদ্রাসার শিক্ষাব্যবস্থা।

কওমি মাদ্রাসা দেখভালের জন্য দেশে একক কোনো কর্তৃপক্ষ নেই। কোনো তদারকি না থাকায় সরকারেরও কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই ওই শিক্ষাব্যবস্থার ওপর। স্বতন্ত্র ধারার এই শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে জাতীয় মূল ধারা কিংবা আন্তর্জাতিক শিক্ষাব্যবস্থার কোনো সমন্বয়ও গড়ে ওঠেনি। এসব মাদ্রাসা থেকে শিক্ষা গ্রহণ শেষে সার্টিফিকেট মিললেও মেলে না রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি। ফলে মেলে না কোনো চাকরিও। প্রায় দেড় শ বছর আগে চালু হওয়া এই

কওমি

শিক্ষাব্যবস্থা



শিক্ষাব্যবস্থায় আজ পর্যন্ত কোনো সংস্কারও হয়নি।

কওমি শিক্ষাব্যবস্থায় সারা দেশে কী পরিমাণ মাদ্রাসা আছে, কতজন শিক্ষার্থী সেগুলোতে অধ্যয়ন করছে তার সঠিক পরিসংখ্যান কোথাও নেই। কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে (২০১৩) মাদ্রাসার সংখ্যা ১৫ হাজার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) ২০১৫ সালের হিসাব অনুযায়ী, সারা দেশে কওমি মাদ্রাসার সংখ্যা ১৩ হাজার ৯০২। কিন্তু সংশ্লিষ্টদের

দাবি, সারা দেশে কওমি মাদ্রাসার সংখ্যা ২০ হাজারের কম না। আর শিক্ষার্থীর সংখ্যা ব্যানবেইসের তথ্যানুসারে প্রায় ১৪ লাখ। তবে সংশ্লিষ্টদের দাবি ২০ লাখের কম না। বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) ২০০৮ সালে 'কওমি মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা-একটি সমীক্ষা' পরিচালনা করে। এই সমীক্ষার জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে তারা বাধার মুখে পড়ে। মাদ্রাসাগুলো তথ্য না দিয়ে

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ১

সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই ১৫ হাজার মাদ্রাসায়

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

বোর্ড থেকে তথ্য নিতে বলে। পরে সবচেয়ে বড় কওমি মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড ঢাকার বেলাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ (বেলাক)-এর কাছ থেকে তথ্য নিয়ে সমীক্ষা রিপোর্ট তৈরি করা হয়। ওই বোর্ডের দেওয়া তথ্যে প্রায় পাঁচ হাজার ২০০ কওমি মাদ্রাসায় আনুমানিক ১৪ লাখ শিক্ষার্থী রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। একটি দূতাবাসের সংগৃহীত তথ্যানুসারে বাংলাদেশে কওমি মাদ্রাসার সংখ্যা ২৩ থেকে ৫৭ হাজার। দেশের মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা প্রধানত আলিয়া ও কওমি এই দুই ধারায় বিভক্ত। ১৮৬৬ সালে ভারতে প্রতিষ্ঠিত 'দারুল উলুম দেববন্দ' মাদ্রাসার অনুকরণে গড়ে উঠেছে কওমি মাদ্রাসা। ইসলাম ধর্মভিত্তিক এ শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সরকার নিয়ন্ত্রিত আলিয়া মাদ্রাসা শিক্ষার সঙ্গে এর রয়েছে অনেক পার্থক্য। সরকার নিয়ন্ত্রিত মাদ্রাসাগুলো থেকে দাখিল-আলিম পাস করা শিক্ষার্থীরা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, টিকিৎসাবিজ্ঞান কিংবা প্রকৌশল বিষয়ে ভর্তির সুযোগ পেলেও কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা এই সুযোগের কথা চিন্তাও করতে পারে না। সরকারি স্বীকৃতি না থাকায় কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা চাকরি থেকে শুরু করে অন্য শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কোনো প্রতিযোগিতায় আসতে পারে না।

কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনের শুরুতেই ধারণা দেওয়া হয়, পার্থিব সুযোগ-সুবিধার জন্য এই শিক্ষা নয়। এলমে দ্বিন অর্জন ও আল্লাহর সন্তুষ্টি আর ইসলাম প্রচারের জন্যই শিক্ষাগ্রহণ। কওমি মাদ্রাসায় ভর্তির নির্দিষ্ট বয়সসীমাও নেই। অধিকাংশ মাদ্রাসার সঙ্গে রয়েছে এতিমখানা। রয়েছে এতিম, দরিদ্র ও অসহায় শিশুদের জন্য আবাসন ও খাওয়া-পারার ব্যবস্থা। ফলে বিনা খরচে ধর্মীয় শিক্ষা লাভের সুযোগ পাচ্ছে বিপুলসংখ্যক দরিদ্র শিশু-কিশোর। এক সময় শুধুই দরিদ্র পরিবারের সন্তানরা কওমি মাদ্রাসায় ভর্তি হলেও এখন অবস্থাগন্ন পরিবারের সন্তানরাও কওমি মাদ্রাসায় ভর্তি হচ্ছে বলে জানা গেছে।

সারা দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিনা মূল্যে পাঠ্যপুস্তক পেলেও কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা তা থেকেও বঞ্চিত।

দেওবন্দ মাদ্রাসার অনুকরণে চালু হওয়া কওমি শিক্ষাব্যবস্থায় প্রায় ১৫ হাজার মাদ্রাসা থাকলেও এগুলোর ওপর কারো কোনো একক নিয়ন্ত্রণ নেই। নেই অনুসরণীয় কোনো একক পাঠ্যক্রম। পারম্পরিক সমন্বয়ও নেই মাদ্রাসা কিংবা মাদ্রাসাগুলোকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা শিক্ষাবোর্ডগুলোর মধ্যে। কওমি মাদ্রাসার শিক্ষা কারিকুলামে সাধারণত আল-কোরআন, হাদিস ও তাকসির, ফিকাহ, কালাম, আরবি সাহিত্য, উর্দু ও ফার্সি অন্তর্ভুক্ত। প্রাথমিক পর্যায়ে থেকেই শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষার বাইরে আরো দুটি ভিন্ন ভাষা শিখতে হয়। কোরআন ও হাদিস পড়ার জন্য শিখতে হয় আরবি। আর দেওবন্দ মাদ্রাসার পাঠ্যক্রমের কিতাবগুলো উর্দু ভাষায় রচিত হওয়ায় শিক্ষার্থীদের শিখতে হয় উর্দু ভাষা। ফার্সি ভাষাও শিখতে হয় কোনো কোনো শিক্ষার্থীকে। সাম্প্রতিককালে কিছু কিছু মাদ্রাসায় বাংলা, ইংরেজি, গণিত ও সমাজবিজ্ঞান পড়ানো হয়। তবে সেগুলো স্কুল পর্যায়েই সীমাবদ্ধ। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) সমীক্ষা রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়েছে, 'যেহেতু সরকার স্বীকৃত কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে ব্যবস্থা নেই, সেহেতু এসব বিষয়ের কারিকুলামের মান সম্পর্কে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।'

কওমি মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা অনুদাননির্ভর। তবে তারা সরকারি কোনো অনুদান গ্রহণ করে না নিজেদের 'স্বাধীন সত্তা' টিকিয়ে রাখার স্বার্থে। মাদ্রাসাগুলো চলে শিক্ষার্থীদের বেতন, বিভিন্ন জনের চাঁদা, দান-খয়রাত, জাকাত, ফিতরা, মানত, সাদকা, কুরবানি পশুর চামড়া সংগ্রহ প্রভৃতি উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করে। কোনো কোনো মাদ্রাসা বিদেশি অনুদানও পেয়ে থাকে। রাষ্ট্রীয় অনুদান গ্রহণের ক্ষেত্রে আপত্তির কারণ সম্পর্কে জানা গেছে, কওমি মাদ্রাসা শুরুর সময় ব্রিটিশ আমলের 'বিধর্মী' শাসকদের প্রতি অবিশ্বাস ছিল তাদের। ধারণা জন্ম নেয় যে শাসকদের কাছ থেকে টাকা নিলে তাদের কথা মতো চলতে হবে। এখন সময় এবং প্রেক্ষাপট বদলালেও এই ধারণায় পরিবর্তন আসেনি। আলিয়া মাদ্রাসাসহ অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকরা এমপিওভুক্তির মাধ্যমে তাদের

বেতন-ভাতা সরকার থেকে গ্রহণ করলেও কওমি মাদ্রাসা ও শিক্ষকরা এ ব্যাপারে আগ্রহী নন। কওমি শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকদের জন্য কোনো বেতন কাঠামো নেই। নেই চাকরির কোনো বিধিমালা। ঢাকার একটি মাদ্রাসার সদরুল মোদাররেসিন জানিয়েছেন, কোনো বেতন কাঠামো না থাকার কারণে শিক্ষকরা মানবতর জীবনযাপন করেন। সম্মানী হিসেবে যা দেওয়া হয় তা উল্লেখ করতে লজ্জাবোধ করেন শিক্ষকরা। এখনো তিন-চার হাজার টাকা সম্মানী পান কোনো কোনো শিক্ষক। তার ওপর সেটা নিয়মিত পাওয়া যায় না। অথচ শিক্ষকদের চাকরি সার্বক্ষণিক। সম্মিলিত কওমি মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের দপ্তর সম্পাদক মাওলানা নাজমুল হক এ প্রসঙ্গে বলেন, মাদ্রাসা থেকে যা দেওয়া হয় তা বেতন না, সম্মানী বা ওজিফা। আর এটা চাকরি না। আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, ইসলামের খেদমতের জন্যই এ পেশায় নিয়োজিত। আল্লাহই রিজিকের মালিক।

মাদ্রাসাগুলোতে প্রায় দুই লাখ লোক কর্মরত আছে বলে ধারণা করা হয়। শিক্ষকদের জন্য কোনো প্রশিক্ষণমূলক ব্যবস্থা নেই। নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য নির্দিষ্ট শিক্ষকও নেই।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কওমি মাদ্রাসা উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা শিক্ষাজীবন শেষে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক পেশায় নিযুক্ত হতে পারে না। তাদের কওমি মাদ্রাসার শিক্ষক, মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন, মক্তবের হুজুর এ রকম পেশায় নিয়োজিত থাকতে হয়। ওয়াজ, কোরআন খতম, মিলাদ, কবর জিয়ারত কিংবা বিশেষ সামাজিক অনুষ্ঠান ছাড়া তাদের আয়ের আর কোনো পথ নেই। কওমি মাদ্রাসার অধিকাংশ শিক্ষার্থী যেহেতু হতদরিদ্র পরিবার থেকে আসে, তাই সমাজের উচ্চ শ্রেণি বা সরকার দীর্ঘদিন এই শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে মাথাও ঘামায়নি।

কওমি মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে কিছু গবেষণাধর্মী লেখালেখি আছে পিরোজপুর-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য অধ্যক্ষ মো. শাহ আলমের। এ শিক্ষাব্যবস্থা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, 'বেশির ভাগ কওমি মাদ্রাসায় আধুনিক জীবনসম্পত্তি শিক্ষাপদ্ধতি ও উপকরণ ব্যবহারের বদলে প্রাচীন পদ্ধতির মুখস্থ ও লেকচারনির্ভর শুধু নিজ ধর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে যে মানবসম্পদ সৃষ্টি হচ্ছে, তা 'না ঘরকা না ঘাটকা'।' তিনি আরো লিখেছেন, 'এ ধারায় শিক্ষা সমাপ্তকারীদের নানা বিতর্কিত কর্মকাণ্ডের জন্য অনেকে নানাভাবে নিপৃহীত হতে হচ্ছে। দেশ, জাতি ও নিজ ধর্মকে রক্ষার জন্যই এ থেকে উত্তরণ দরকার। এ জন্য প্রয়োজন কওমি মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন। তাহলে হয়তো এক সময় কওমি মাদ্রাসাগুলো ঘুরে দাঁড়াবে, জেগে উঠবে শিক্ষার্থীরা, যারা আমাদের অব্যবহৃত সম্পদ।'

কওমি মাদ্রাসাগুলোর অধিকাংশ আবাসিক। শিক্ষক, শিক্ষার্থীরা মাদ্রাসা ক্যাম্পাসেই বসবাস করে। এই শিক্ষাব্যবস্থায় সহশিক্ষার বিধান নেই। মেয়েদের জন্য কোথাও কোথাও আলাদা মহিলা মাদ্রাসা রয়েছে। এর মধ্যে অনেকগুলো বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত হয়।

ব্যানবেইসের সমীক্ষা রিপোর্টে 'কওমি মাদ্রাসাব্যবস্থা দেশের প্রচলিত অন্যান্য শিক্ষাব্যবস্থার ন্যায় সরকারের আওতায় আনার' এবং কারিকুলামকে সরকারি তত্ত্বাবধানে আনার কথা বলা হয়। কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ ও গুলামা মাসায়েজদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করে বর্তমান কারিকুলামকে যুগোপযোগী ও আধুনিক করার সুপারিশ করা হয়। এরপর ২০১০ সালে জাতীয় শিক্ষানীতি চালু হলে দেশে প্রচলিত আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা ও আলিম মাদ্রাসায় এই শিক্ষানীতি কার্যকর হয়। বিদেশি কারিকুলামে পরিচালিত ইংলিশ মিডিয়ামের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোও এই শিক্ষানীতি অনুসরণ করে। কিন্তু শুধু বাইরে থেকে গেছে কওমি শিক্ষাব্যবস্থা।

জাতীয় শিক্ষানীতিতে এই স্বতন্ত্র ধারার কওমি শিক্ষাব্যবস্থার জন্য আলাদা একটি কমিশন গঠনের প্রস্তাব করা হয়। তারই আলোকে ২০১২ সালের ১৫ এপ্রিল সরকার 'বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কমিশন' গঠন করে। কমিশন এক বছরের মাথায় ২০১৩ সালের ১৩ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর কাছে শিক্ষানীতি উপস্থাপন করে। সরকার এই শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। কিন্তু একটি পক্ষের বিরোধিতার কারণে তখন পিছিয়ে যায় সরকার। সম্প্রতি সরকার আবার এই কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। পর্যালোচনার জন্য একটি কমিটিও গঠন করে দিয়েছে।